রোহিঙ্গা গণহত্যা ঃ কাঠগড়ায় সু চি

ইমরুল কায়েস

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশন

প্রকাশকের কথা

ইতিহাসের বইয়ে কিংবা পত্রিকার খবরে পৃথিবীর নৃশংস গণহত্যাগুলোর বেদনা বিধুর বর্ণনা পড়েছি। সেই বর্বরতা চাক্ষুষ দেখার কষ্ট পেতে হয়নি। কিন্তু আমাদের জীবদ্দশায় ঘটে যাওয়া এক নারকীয় গণহত্যার চাক্ষুষ সাক্ষী আমরা। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের প্রতিবেশী মায়ানমারের সামরিক জান্তা প্রভাবিত সরকারের নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞের বলি হওয়া রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর করুণ ইতিহাস লিখতে হচ্ছে। 'রোহিঙ্গা গণহত্যা ঃ কাঠগড়ায় সু চি' গ্রন্থে লেখক ইমরুল কায়েস রোহিঙ্গাদের অতীত, বর্তমানকে খুব গুছিয়ে উপস্থাপন করেছেন।

আরাকানের সাম্প্রতিক ঘটনাবলি সম্পর্কে সম্মানিত পাঠকবৃন্দ নিশ্চয় পূর্ণ ওয়াকিবহাল। তবুও কেন এই বই? মূলত দুটি দিক বিবেচনায় আমরা এই বই ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করছি। প্রথমত, ইতিহাসের একটা দায়বদ্ধতা আছে। আজ থেকে এক হাজার বছর পরের প্রজন্ম আরাকানের বর্তমান সময়ের নিষ্ঠুরতা জানতে চাইবে। আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য তথ্য দুনিয়ায় এই বইটি উপস্থাপন করলাম। এখন থেকে পরবর্তী সময়ের যে কেউ সঠিক ইতিহাস জানতে পারবে ইনশাআল্লাহ। দ্বিতীয়ত, পরিকল্পিতভাবে শিক্ষা বঞ্চিত রোহিঙ্গা মুসলিমদের স্বাধীনতার সুখই বুঝতে দেয়া হচ্ছে না। আমাদের বিশ্বাস কেউ না কেউ দাঁড়িয়ে যাবে। আত্মাধিকারের স্বীকৃতি পেতে মুক্তির মিছিল শুরু হবে আরাকানের মাটিতে। এই বই ভবিষ্যতের রোহিঙ্গা জাগরণের অগ্রপথিকদের কিছুটা পথ দেখাবে বলে আশা করছি।

ইমরুল কায়েস ভাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। অত্যন্ত বিনয়ী এই মানুষটি এই বই নিয়ে কতটা সিরিয়াস ছিলেন, আমি জানি। আরাকানের মজলুমদের এই কঠিন সময়ে '*গার্ডিয়ান পাবলিকেশন*' বইটি প্রকাশের অংশ হতে পেরে কৃতজ্ঞ। আজ হোক, কাল হোক- আরাকানের মুক্তির ভোর আসবেই।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
বাংলাবাজার, ঢাকা।
২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

লেখকের কথা

সাম্প্রতিক সময়ে রোহিঙ্গাদের ভয়াবহ গণহত্যা ও বিতাড়িত হবার পটভূমিতেই *'রোহিঙ্গা গণহত্যা ঃ কাঠগড়ায় সু চি'* বইটি লেখা হয়েছে। বইটিতে হয়তো রোহিঙ্গা মুসলমানদের করুণ দুর্দশা ও নির্যাতনের সমগ্র চিত্রের সবটাই তুলে ধরা সম্ভব হয়নি। তবে প্রামাণ্য তথ্যভিত্তিক লেখা বইটি পড়লে সহজেই রোহিঙ্গাদের করুণ অবস্থার পুরো চিত্র সম্পর্কে ধারণা লাভ হবে। পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত এ বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে আরাকানে রোহিঙ্গা মুসলমান, রাখাইন মগ ও বর্মিদের আগমনের ইতিহাস তুলে ধরার পাশাপাশি রোহিঙ্গাদের বর্তমান প্রজন্ম যে সেখানে বহিরাগত নয়, তা তথ্য-উপাত্ত ও যুক্তির আলোকে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। ইতিহাসের নানা বাঁকে আরাকানে বসতিগাড়া এই তিন জাতির একে-অপরকে বহিরাগত বলার নৈতিক ভিত্তি নেই, বর্মিদের তো নয়ই। কারণ, তারাই সেখানে সবার পরে এসেছে, তাও আবার দখলদার হিসেবে। বর্মিদের ষড়যন্ত্র ও কূটকৌশলই যে আরাকানে যুগ যুগ ধরে শান্তিতে সহাবস্থান করে আসা রোহিঙ্গা ও মগ দ্বন্দ্বের কারণ, তা দ্বিতীয় অধ্যায়ের শুরুতেই উঠে এসেছে। একই সাথে ২০১৭ সালের রোহিঙ্গা গণহত্যা ও উচ্ছেদ অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ, পূর্বপরিকল্পিত এ অভিযানের প্রেক্ষাপট তৈরি করতেই যে মিয়ানমার সরকার ও সেনাবাহিনী ২৫ আগস্ট সাজানো হামলার ঘটনা ঘটায় তা তথ্য-প্রমাণের আলোকে তুলে ধরা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে গণতান্ত্রিক ছদ্মাবরণে ডাইনিরূপী অং সান সু চির মুখোশ বিশ্ববাসীর সামনে খোলাশা করার পাশাপাশি সে ও তার সেনাপ্রধানকে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর পন্থা নির্দেশের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। আর চতুর্থ অধ্যায়ে রোহিঙ্গা ইস্যুকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, চীন, রাশিয়াসহ পরাশক্তিগুলোর স্বার্থগত দ্বন্দ্ব, জাতিসংঘের ঢিমেতালে ভূমিকা, মুসলিমবিশ্ব তথা ওআইসি'র 'এই আছি, এই নাই' ভূমিকার কারণ বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশের কূটনৈতিক প্রচেষ্টা সবিস্তারে ও নির্মোহভাবে বর্ণনার পাশাপাশি বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সংকট সমাধানে আরও কী করা যেতে পারে, সে বিষয়ে কিছু নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে 'কফি আনান কমিশন'-এর সুপারিশের পূর্ণ বাস্তবায়নই সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য উপায় বলে আমার বিশ্বাস। তাই এই সুপারিশমালাও বইয়ে সংযোজন করা হয়েছে। আশা করি পাঠকরা বইটি থেকে রোহিঙ্গাদের অতীত, বর্তমান– এমনকি ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও মোটামুটি ধারণা লাভ করতে পারবেন।

রোহিঙ্গাদের নিয়ে কখনো লিখব বা লিখতে হবে, সে ভাবনা গোড়াতে ছিল না। তবে সাম্প্রতিককালে (২০১৬ ও ২০১৭ সালে) মিয়ানমারের রোহিঙ্গা বিরোধী ভয়াবহ গণহত্যা অভিযান, এ বিষয়ে লেখার ভাবনা মাথায় নিয়ে আসে। এক্ষেত্রে বাংলাভিশনের অ্যাডভাইজার (এনসিএ) ড. আবদুল হাই সিদ্দিক মহোদয়ের প্রতি কৃতজ্ঞ।

কারণ, তিনিই একদিন আলাপের এক ফাঁকে রোহিঙ্গা বিষয়ক লেখার ভাবনা মাথায় ঢুকিয়ে দেন। পরবর্তী সময়ে লেখার বিষয়ে তিনি খোঁজখবরও নিয়েছেন। আরেকজন ব্যক্তি যিনি এই বইটি লেখার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময় পরামর্শ দিয়েছেন ও খোঁজ খবর নিয়েছেন, তিনি হলেন বর্তমান সময়ের জনপ্রিয় কলামিস্ট তরুণ আইনজীবী ব্যারিস্টার সাইফুর রহমান। লেখালেখিতে সব সময় উৎসাহ দেয়ার জন্য বন্ধুপ্রতিম এই সজ্জন ব্যক্তিটিকে ধন্যবাদ জানাই। রোহিঙ্গাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে ড. মোহাম্মদ মুহিবুল্যাহ ছিদ্দিকী সম্পাদিত এবং ড. মুহম্মদ এনামুল হক, আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ, মুহম্মদ সিদ্দিক খানসহ বেশ কয়েকজন প্রথিতযশা লেখকের প্রবন্ধ সংকলণ গ্রন্থ' 'আরাকানের মুসলমান : ইতিহাস ও ঐতিহ্য' এবং ড. মাহফুজুর রহমান লিখিত 'আরাকানের মুসলমানদের ইতিহাস' বই দুটি ব্যাপক সাহায্য করেছে। তাদের সবাইকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ রাখব। বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দৈনিকে প্রকাশিত বিখ্যাত কলামিস্ট ও সাংবাদিকদের এ সংক্রান্ত অনেক লেখা এবং প্রতিবেদন আমাকে দারুণভাবে সহায়তা করেছে। তাদের সবার নাম লিখতে গেলে কলেবর বেড়ে যাবে বিধায় সে চেষ্টায় ক্ষান্ত দিলাম। তবে সবার প্রতিই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। নানা সময়ে পরামর্শ ও উৎসাহ দিয়ে সহায়তার জন্য বাংলাভিশনের হেড অব নিউজ মোস্তফা ফিরোজ, জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের সিনিয়র পেশ ইমাম মুফতি মিজানুর রহমান, ইসলামি ফাউন্ডেশনের সাবেক কর্মকর্তা নুরুজ্জামান ফারুকী এবং পত্রিকার কাটিং ও তথ্য-উপাত্ত সরবরাহের জন্য ছড়াকার আবু বকর সিদ্দিক, হাফেজ আকরাম হোসেন ও শোয়াইবুর রহমানকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। লেখালেখিতে সব সময় প্রেরণা দেয়ার জন্য পাবনার সুজানগরে চিত্রনায়ক ইলিয়াস কাঞ্চন প্রতিষ্ঠিত জাহানারা কাঞ্চন স্মৃতি উচ্চবিদ্যালয়ের সভাপতি আমার বাবা আব্দুর রাজ্জাক মোল্লা, মাতা হাসিনা বেগম, শ্বশুর সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল গফুর, শাশুড়ী মরিয়ম মিরা, বড় মামা সাইদুল ইসলাম, মেজো মামা জহুরুল ইসলাম, সেজো মামা সিরাজুল ইসলাম, ছোট মামা আমিরুল ইসলাম, শিক্ষক মো. খলিলুর রহমান স্যার ও ভায়রা ভাই জিয়াউর রহমানকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার দুই ভাই মোস্তফা কামাল ও আতিকুল আলম, বোন নুরজাহান পারভিন, দুলাভাই সাহাবুল আলম, ভাগ্নী রুকাইয়া আলম, ভাগ্নে অপূর্ব,

শ্যালকদ্বয় জাহিদ খোকন ও জাহিদ সুমন এবং সহকর্মী মেহরাব হোসাইন খানও লেখালেখির উৎসাহ দাতাদের মধ্যে অন্যতম। স্ত্রী মৌসুমী আক্তার স্বপ্নার ঐকান্তিক সহায়তা ও উৎসাহ এবং ছেলে ইমরুল জিসান সাদের বাবার লেখা বই পড়বার আগ্রহ, এই বই লেখার ক্ষেত্রে প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। সর্বোপরি বই প্রকাশে সহায়তার জন্য '*গার্ডিয়ান পাবলিকেশন*'-এর প্রকাশক নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের এবং তরুণ সাংবাদিক মুজাহিদ শুভকে বিষেশভাবে ধন্যবাদ ও শুভ কামনা জানাচ্ছি।

ইমরুল কায়েস
৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ ঢাকা।

সূচিপত্র

আরাকানের অবস্থান ও প্রাথমিক ইতিহাস ১১
আরাকানে মুসলমানদের আগমন ও রোহিঙ্গাদের উদ্ভব ১৬
থান্ডইক্যা বা থান্ডুকেয়া ২১
জেরবাদী ২১
কামানচি ২১
রোহিঙ্গা ২২
আরাকানের রাজনীতি, সংস্কৃতি এবং সামাজিক জীবনে মুসলমান ও রোহিঙ্গারা ২৪
মিয়ানমার ও আরাকানের রাজনীতিতে মুসলমান ও রোহিঙ্গা ২৯
আরাকানে মগ বা রাখাইন ও বৌদ্ধবাদের আগমন ৩১
রোহিঙ্গারা বহিরাগত হলে বর্মি-রাখাইন সবাই বহিরাগত ৩৫

মগদের রোহিঙ্গা বিদ্বেষী হবার কারণ ও রোহিঙ্গা বঞ্চনার সূত্রপাত ৪১
জান্তা সরকারের নির্যাতন ও গণহত্যা ৪৪
২০১২ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও রোহিঙ্গাদের বিতাড়ন ৪৭
সাম্প্রতিক রোহিঙ্গা গণহত্যা (২০১৬-১৭) : ক্লিয়ারেন্স অপারেশন (২০১৬) ৫০
ক্লিয়ারেন্স অপারেশন (২০১৭) ৫২
সাংবাদিক, পর্যবেক্ষক ও ত্রাণকর্মী প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা ৫৫
গণমাধ্যম, নির্যাতিত ও প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে বর্মী বাহিনীর নৃশংসতা (২০১৭) ৫৫
সীমান্তে স্থল মাইন পুঁতে রোহিঙ্গা হত্যা ৬০
রোহিঙ্গা নির্যাতনে জঙ্গি ও উগ্র বৌদ্ধ ভিক্ষুরাও জড়িত ৬১
‘গণহত্যা, ‘জাতিগত নির্মূল’ গণধর্ষণসহ মানবতাবিরোধী অপরাধ ৬২
‘জাতিগত নির্মূল’ ৬৩
মিয়ানমার কেন রোহিঙ্গাদের তাড়াতে চায় ৭১

রোহিঙ্গা সংকট ও সু চি **৭৬**
যে কারণে সু চি রোহিঙ্গা বিদ্বেষী ৭৬
রোহিঙ্গা নিধন নিয়ে সু চির মিথ্যাচার ৭৯
বিশ্বাসঘাতক সু চি ৮২
বাংলাদেশের সাথে আলোচনার নামে সু চির ভাঁওতাবাজি ৮৫
সু চির সমালোচনায় জীবনীকার, নোবেল বিজয়ী ও অন্যরা ৮৮
সু চির নোবেল কেন প্রত্যাহার হবে না ৯০
সু চির লোক দেখানো তদন্ত কমিশন গঠন ৯২
রোহিঙ্গা ইস্যু চাপা দিতে সু চি ও জেনারেল হ্লাইং এর কূটকৌশল ৯৪
কফি আনান কমিশন ও সু চির চাতুরিপনা ৯৫
রোহিঙ্গা গণহত্যা : কাঠগড়ায় সু চি ও জেনারেল হ্লাইং ৯৮

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অবস্থান ও কূটনৈতিক তৎপরতা **১০৭**
জাতিসংঘের প্রশ্নবিদ্ধ ভূমিকা ১০৭
জাতিসংঘের তদন্ত দল ও সু চির ভণ্ডামি ১১৩
যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ইউরোপিয় ইউনিয়নের ভূমিকা ১১৪
যুক্তরাষ্ট্রের ফাঁকা বুলি ১১৬
যুক্তরাজ্যের দ্বৈত নীতি ১১৯
কানাডা ১১৯
ইউরোপিয় ইউনিয়নের দুর্বল ভূমিকা ১২২
পশ্চিমারা কেন কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে না ১২১
ভারত, চীন ও রাশিয়ার অবস্থান **১২২**
ভারতের কৌশলী অবস্থান: পেছনে জাতীয় স্বার্থ ১২২
চীন কেন মিয়ানমারের পক্ষে ১২৬
রাশিয়ার বিতর্কিত ভূমিকা ১২৭
অস্ত্র ব্যবসায় চাপা রোহিঙ্গা ইস্যু ১২৮
ভূ-রাজনীতির কবলে রোহিঙ্গা ইস্যু ১২৯
ওআইসি ও মুসলিম দেশগুলোর ভূমিকা ১৩২

সোচ্চার মালয়েশিয়া-ইন্দোনেশিয়া-তুরস্ক ১৩৩
জাতিসংঘে ভোটদানে বিরত ইরান ১৩৬
অন্যান্য মুসলিম দেশের ভূমিকা ১৩৭
পাকিস্তান নিশ্চুপ কেন ১৩৭
সমালোচিত পোপ ১৩৯

বাংলাদেশ ও রোহিঙ্গা সংকট ১৪৩
বাংলাদেশে রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুর ঢল ১৪৩
রোহিঙ্গা সংকটের প্রভাব ১৪৭
স্থানীয় জনসাধারনের সমস্যা ১৪৮
পরিবেশ ও পর্যটন সমস্যা ১৪৮
ঠেঙ্গার চরে স্থানান্তর ১৪৯
সংকট কাটাতে বাংলাদেশের পদক্ষেপ ১৫০
রোহিঙ্গা প্রত্যাবর্তনে সমঝোতা : সম্ভাবনা নাকি অনিশ্চয়তা ১৫১
সংকটের স্থায়ী সমাধানে আরও কিছু করণীয় ১৫৫

আরাকানের অবস্থান ও প্রাথমিক ইতিহাস

বাংলাদেশের পূর্ব-দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের তীর ঘেঁষে অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর আরাকান অঞ্চল। আরাকান বর্তমানে মিয়ানমারের একটি অঙ্গরাজ্য যেটি রাখাইন স্টেট নামে পরিচিত। এর উত্তরে মিয়ানমারের চিন প্রদেশ ও ভারত, দক্ষিণ ও পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর, উত্তর ও পশ্চিমে নাফ নদী এবং বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম, পূর্বে মিয়ানমারের বিশাল ইয়োমা পর্বতমালা। আরাকান হলো বাংলাদেশের বান্দরবান ও কক্সবাজার জেলা সংলগ্ন। সমগ্র আরাকান অঞ্চলটি উত্তর-পশ্চিমে ১৭১ মাইলব্যাপী জল ও স্থল সীমারেখা সহকারে বাংলাদেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত। ৫০ মাইল দৈর্ঘ্য সম্পন্ন নাফ নদী দ্বারা আরাকান বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন। নাফ নদীর পূর্বতীরে আরাকানের মংডু টাউনশিপ এবং পশ্চিমতীরে বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার টেকনাফ ও পর্যটন কেন্দ্র সেন্টমার্টিন। পূর্বে আরাকানের আয়তন ছিল ২০ হাজার বর্গমাইল। ১৯৪৮ সালে স্বাধীনতা পরবর্তী পার্বত্য আরাকানকে মিয়ানমারের চিন প্রদেশ এবং দক্ষিণ আরাকানের কিছু অংশ ইরাবতী অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত করায় বর্তমানে আরাকানের আয়তন প্রায় ১৪,২০০ বর্গমাইল[১]। আরাকানের দৈর্ঘ্য ৩৬০ মাইল। তবে প্রস্থে ভিন্নতা রয়েছে। উত্তর আরাকান অঞ্চলটি বেশ প্রশস্ত। এর প্রস্থ প্রায় ১০০ মাইল এবং দক্ষিণাংশে নিচের দিকে ক্রমশ সরু, যার প্রস্থ প্রায় ২০ মাইল। পূর্বে দুর্গম, দুর্ভেদ্য, বিশাল ও সুউচ্চ ইয়োমা পর্বতমালা আরাকানকে মিয়ানমারের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। ইয়োমা পর্বতমালা দক্ষিণে নেগ্রাইস অন্তরীপ থেকে শুরু হয়ে উত্তরে ৯৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে ভারতের মণিপুর পর্যন্ত পৌঁছেছে। এর মধ্যে নাগা, চিন, লুশাই এবং পাটকাই পাহাড় অন্তর্গত। এর বেশিরভাগ পর্বতের উচ্চতা ৯১৫ থেকে ১৫২৫ মিটার। আরাকান ইয়োমার সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ মাউন্ট ভিক্টোরিয়া, এর উচ্চতা ৩,০৫৩ মিটার। এই বিশাল পর্বতমালাই ভৌগলিকভাবে আরাকানকে মিয়ানমারের মূল ভূ-খন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে।

খ্রিষ্টপূর্বাব্দকালেই আরাকানে জনবসতি গড়ে ওঠে বলে সেখান থেকে উদ্ধার হওয়া, বিভিন্ন শিলালিপি থেকে জানা যায়। আরাকানের প্রাচীন জনগণ বলতে মঙ্গলীয়, ভোট চীনা, মুরং, খুমী, চাক, সিন, সেন্দুজ, ম্রো, খ্যাং, উইনাক, মারু, পিউ প্রভৃতি কিরাত উপজাতীর জনগোষ্ঠীকে বুঝায়[২]। পরবর্তীকালে আরব, ইরানী, আফগানী, গৌড়ীয় ও ভারতীয়সহ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মুসলমানরা আরাকানে এসে বসতি স্থাপন করে।

তারা এখানকার জনগোষ্ঠীর মহিলাদের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হতো। এজন্য তাদের ঔরস ও গর্ভজাত আরাকানী বর্ণসংকর মুসলমান জনগোষ্ঠীর আকার-আকৃতি এবং দৈহিক গঠনে বৈচিত্র সৃষ্টি হয়। পূর্ব তিব্বত থেকে তিব্বত-বার্মান গোত্রের জনগোষ্ঠী প্রাচীনকালে আরাকানে এসে বসতি স্থাপন করে[৩]। তবে এর সঠিক সময় চিহ্নিত করা কঠিন।

মিয়ানমারের প্রাচীন রাজাদের কিংবদন্তীমূলক উপাখ্যান মহারাজোয়াং-এর উদ্ধৃতি দিয়ে ঐতিহাসিক এ. পি. ফেয়ার উল্লেখ করেন, প্রাচীনকালে আরাকানের রাজক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল মারু রাজবংশ। তারা ২৬৬৬ অব্দে আরাকানের রাজ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন[৪]। ভারতের কাশীধামের বেনারস অঞ্চলের এক সামন্ত রাজা আরাকানে এসে একটি রাজ্যস্থাপন করে শাসনকার্য পরিচালনা শুরু করেন। বর্তমান স্যান্ডোয়ে শহরের নিকটবর্তী রামরিতে তিনি রাজধানী স্থাপন করেন। তারই বংশধরগণ দীর্ঘদিন আরাকান শাসন করেন। তাদের শাসনের শেষ পর্যায়ে আরাকানে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। রাজ্যে অশান্তির কারণে প্রজা বিদ্রোহের ফলে রাজারা বিতাড়িত হন। তাদের একমাত্র কন্যাকে ক্ষমতায় বসায় প্রজারা। কিন্তু তিনি রামরি ত্যাগ করে এক ব্রাহ্মণ যুবককে বিয়ে করেন। ধন্যাবতী নামে তাদের একটি কন্যা সন্তান জন্মে। উক্ত কন্যাকে কালাদান নদীর তীরবর্তী মারুবংশীয় এক রাজপুত্র বিবাহ করেন এবং স্ত্রীর নামানুসারে ধন্যাবতী নগরী নাম দিয়ে সেখানে রাজধানী স্থাপন করে শাসনকার্য শুরু করেন। এ বংশের রাজাগন বংশ পরম্পরায় ১৮৩০ বছর আরাকানে রাজত্ব করেন। এ বংশের শেষ রাজার আমলে প্রজাগণ বিদ্রোহ করে রাজাকে হত্যা করে। তখন রানী দুই কন্যাসহ কাউকপান্ডায়ং পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

মহারাজোয়াংয়ের আরেকটি কাহিনী সূত্রে জানা যায়, গৌতম বুদ্ধের জন্মের বহুপূর্বে অভিরাজ নামক একজন রাজার রাজ্যে বিদ্রোহ দেখা দিলে, তিনি রাজ্য ত্যাগ করে বার্মার ইরাবতী নদীর তীরবর্তী 'টাগাউন' নামক স্থানে একটি রাজ্য স্থাপন করেন। তার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বে ছোট ভাই কানরাঞ্জি জয়ী হয়ে রাজা হন। বড় ভাই কানরাজগী উত্তর আরাকানের কাউকপান্ডায়ং পর্বতে গিয়ে আশ্রিত রাজকন্যাদের একজনকে বিবাহ করে সেখানে রাজ্য স্থাপন করেন। কানরাজগী বংশের ৬২জন রাজা ১৭ শ ৩২ বছর আরাকানে রাজত্ব করেন। এ বংশের পতনের পরই ১৪৬ খ্রিষ্টাব্দে আরাকানে চন্দ্রসূর্য বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৪৬ খ্রিষ্টাব্দে মগধ (ভারতের বিহারের পাটনা ও গয়া জেলা মিলে মগধ গঠিত ছিল) থেকে চন্দ্রসূর্য নামে একজন সামন্ত রাজা আরাকান ও চট্টগ্রাম দখল করে সেখানকার রাজা হন।

আরাকানের পূর্ব রাজধানী ধন্যাবতীতেই তিনি রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি নিজে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন বলে, তার অনুসারীদের মধ্যে দুই ধর্মের লোকই ছিল। চন্দ্রসূর্য বংশের ২৫জন রাজা ৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত আরাকান শাসন করেন।

৭৮৮ সালে মহৎইঙ্গ চন্দ্র বৈশালীতে রাজধানী স্থাপন করে আরাকানের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে চন্দ্র বংশীয় রাজত্বের সূচনা করেন। তার উদার নীতির কারণে আরাকানে ইসলাম প্রচার-প্রসার লাভ করে। এই বংশের ১২ জন শাসক ছিলেন। শেষ রাজা ঘামিংঘাতুম বর্মি উপজাতীদের অতর্কিত আক্রমণে নিহত হলে, তার ছেলে খেত্তাথিং সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি উপজাতি আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য রাজধানী পিনসা বা চাম্পাওয়াত নগরে স্থাপন করে, চাম্পাওয়াত রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এ রাজবংশের ১৫ জন রাজা আরাকান শাসন করেন। চাম্পাওয়াত রাজবংশের ৬ষ্ঠ রাজা পুন্নাকা-এর শাসনামলে ১০৫৭ খ্রিষ্টাব্দে বার্মার অন্তর্গত পঁগা রাজ্যের রাজা আনাওয়ারাথা আরাকান দখল করে নিজ রাজ্যভুক্ত করেন এবং বৈশালী রাজকন্যা পঞ্চকল্যাণীকে বিয়ে করেন। এসময় চট্টগ্রামও দখল করে আনাওয়ারাথা পঁগা সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। ফলে ১০৫৭ সাল থেকে বাকি ১০জন রাজা ১১০৩ সাল পর্যন্ত পঁগার করদরাজা হিসেবে আরাকানে শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

১১০৩ সালে চাম্পাওয়াত রাজবংশের ভূতপূর্ব সপ্তম করদরাজা মিনবুলির পুত্র লেতিয়া মেংগাং আরাকানের সিংহাসনে আরোহণ করে রাজধানী চাম্পাওয়াত থেকে স্থানান্তর করে পেরিন-এ নিয়ে যান। পেরিন বংশের মোট ৮জন রাজা ১১০৩ থেকে ১১৬৭ সাল পর্যন্ত ৬৪ বছর আরাকানে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। পেরিন রাজবংশের অষ্টম ও শেষ রাজা অনানথিরির ভাই মেংফুনসা ১১৬৭ সালে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে রাজধানী পেরিন থেকে কিরিত নামক স্থানে নিয়ে কিরিত রাজবংশের শাসনের সূচনা করেন। এ বংশের ১৬ জন রাজা ১২৩৭ সাল পর্যন্ত আরাকানের ক্ষমতায় ছিলেন। চাম্পাওয়াত রাজা ঘানালুমের পুত্র লাংমা ফিউ ১২৩৭ খ্রিষ্টাব্দে আরাকানের শাসনভার গ্রহণপূর্বক রাজধানী লংগিয়েতে স্থানান্তর করেন। এ বংশে মোট ১৮ জন রাজা ১৪০৪ সাল পর্যন্ত আরাকানের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। এ বংশের শেষ রাজা মিনসুয়া মুন বা নরমিখলা ১৪০৪ সালে দখলদার বর্মিরাজা মেঙ শো আই কর্তৃক উচ্ছেদ হলেও পরবর্তী সময়ে বাংলার সুলতান জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ শাহের সহায়তায় ১৪৩০ সালে আবারও আরাকান পুণরুদ্ধার করতে সমর্থ হন এবং ম্রাউক উ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি আরাকানের রাজধানী ম্রোহং এ স্থানান্তর করেন। ১৪৩০ থেকে ১৬৮৪ সাল পর্যন্ত ২৫৪ বছর আরাকান বাংলার করদরাজ্য হিসেবে শাসিত হয়।

এসময় আরাকানের রাজারা বৌদ্ধ নামের পাশাপাশি বাংলার সুলতানদের অনুকরণে ইসলামি নাম ধারণ করতেন (বিস্তারিত পরে আসছে)। ১৬৮৪ সাল থেকে ১৭৮৪ সালে বর্মি রাজা বোধপায়া দখলের আগ পর্যন্ত আরাকান মোটেও স্থিতিশীল ছিল না। ১৭১০ সালে সান্দা উইজ্যা ক্ষমতায় আসার পর ক্রমশ সামন্তদের ক্ষমতা বেড়ে যেতে থাকে এবং এক পর্যায়ে সামন্তদের নেতৃত্বে গোটা আরাকান ৬টি কেন্দ্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে। কোনো সামন্ত রাজ শক্তি সংগ্রহ করে রাজধানী ম্রোহং দখল করতে উদ্যত হলে বাকিরা একত্রে জোট বেঁধে সে উদ্যোগ ব্যর্থ করে দিত।

১৭৮২ সালে রামরির সামন্ত রাজ থামাডা আরাকানের ক্ষমতা দখল করলে হারি নামক জনৈক সামন্ত অন্যদের সহায়তায় থামাডাকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। হারি পূর্বসুরীর মতো সিংহাসনচ্যুত হবার ভয়ে বর্মি রাজের করদরাজা হিসেবে আরাকান শাসনে মনস্থির করেন। যাতে অন্য সামন্তরা ষড়যন্ত্র করতে না পারে– সেজন্য তিনি বার্মার আলাংপায়া বংশের রাজা বোধপায়ার সাথে চুক্তি করে তাকে আরাকান আক্রমণের আমন্ত্রণ জানান। রাজা বোধপায়া এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করে ১৭৮৪ সালে আরাকান দখল করে নেন। বোধপায়ার দখলের মধ্যদিয়ে আরাকানের স্বাধীনতা চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে বর্মি রাজা বোধপায়া বিশ্বাসঘাতকতা করে তার আমন্ত্রণকারী আরাকানের রাজা হারিকে হত্যা করে। হারির ছেলে সিন পিয়ান পালিয়ে ব্রিটিশ শাসিত চট্টগ্রামে আশ্রয় নেন। সিন পিয়ান অনুগতদের নিয়ে আরাকানকে বার্মার দখল মুক্ত করতে বেশ কয়েক বছর লড়াই চালিয়ে যান। কয়েকবার বেশকিছু এলাকা দখল করতে সমর্থ হলেও, রাজধানী দখল করতে না পারায় তার আরাকান মুক্তি স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে যায়। প্রয়োজনীয় লোকবল, সরঞ্জামের অভাব এবং ভারতবর্ষের দখলে থাকা বেনিয়া ব্রিটিশদের মামলা-হামলার কারণে তার মুক্তি সংগ্রাম সফল হয়নি। আরাকানে দখলদার বর্মি বাহিনী আর চট্টগ্রামে ব্রিটিশ বাহিনীর তাড়া খেয়ে দীর্ঘদিন বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়ে বিপর্যস্ত আরাকানের স্বাধীনতাকামী বীরপুরুষ সিন পিয়ান ১৮১৫ সালের ২৫ জানুয়ারি, পোলং চরানের পাহাড়ী এলাকায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আরাকানের স্বাধীনতার স্বপ্নেরও মৃত্যু হয়। অবশেষে ১৮২৬ সালে আরকান ব্রিটিশদের দখলে আসে। ব্রিটিশ শাসনের পর ১৯৪৮ সালে বার্মার স্বাধীনতার সময় রোহিঙ্গা মুসলমানদের দাবি উপক্ষা করে বর্মি ও মগদের সাথে আঁতাত করে, কূটকৌশলী ব্রিটিশরা আরাকানকে বার্মার অংশ হিসেবে দিয়ে দেয়। ফলে আরাকানের স্বাধীনতা চিরতরে ভূলুণ্ঠিত হবার পাশাপাশি আরাকানবাসীরা বর্মিদের পদানত শোষিত শ্রেণিতে পরিণত হয়। তাদের মধ্য থেকে ধীরে ধীরে আরাকানী জাতীয়তার চেতনাও বিলুপ্ত হয়ে যায়।